ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1134-1139
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.113

শিরোনাম : তারাশঙ্করের গল্পে একাল-সেকাল

অমিত মুর্মু, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.05.2025; Accepted:25 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

Time is always changing. This time flows at its own pace towards its desired goal. Where the memories of the past are mixed with the present and moving towards the future, its meaning seems to be. Where good and bad, happiness and sorrow honor and pride, everything seems to be mixed in the stream of this time. In this flow, the stream of new time comes again and establishes a relationship with the old. In this way, the game of time continues in a cycle. Through this discussion, an attempt will be made to see how the storyteller Tarashankar Banerjee has tried to capture two times in his short stories. An attempt has been made to explore this era and the era through his selected stories. Where Tarashankar has presented the acceptability of the new through the emergence of its acceptance and the irrelevance of the old before the reader through contradiction. He has tried to explore the country, time, person and moving history in stories like 'Jalsaghar', 'Khajanchibabu', 'Pitaputra', 'Maydanab', 'Bisphoran', 'Poushalakshmi', 'Jatayu' and 'Jammantar'. The discussion will attempt to analyze the stories keeping in mind the author's strong sense of that deep time consciousness. Where the dazzling splendor of the past smiles a smile of contempt in front of the dilapidated skeletal form of that time. And taking this insult, contempt and humiliation in his heart, he has left the new on the old path. And to definitely welcome this arrival of the new, leaving the old behind in the path of time, the author has arranged flower offerings on both sides of the path.

Keywords: Landlord, Conflict, New and old, Change

> "সে কালকে শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তাঁর মহিমার কাছে আমি নতমস্তক, তার ত্রুটি বিচ্যুতি, অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত।"[১]

কাল সম্পর্কে তাঁর এই অনুভূতি তিনি আমাদের জানাচ্ছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মকাল উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে। তারাশঙ্কর তাঁর পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে অনেক অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছেন। কারণ, তাঁর পিতার বিদ্যার প্রতি গভীর অনুরাগ, তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বলা বাহুল্য, পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই সেকাল এবং নিজের কালকে প্রত্যক্ষ করেছেন গল্পকার। তাই তারাশঙ্করের সাহিত্যমানস ও রচনাশৈলী এই বিচিত্র প্রেক্ষাপটে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর আবির্ভাব সেকাল ও একাল এর সন্ধিলগ্নে। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থাকে যে, কাল-কালান্তরের সম্পর্কে তারাশঙ্করের অবস্থান কোথায়? এখানে আমরা তাঁর স্মৃতিকথা 'আমার কালের কথা' থেকে এ প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি। কাল-কালান্তরকে তারাশঙ্কর দেখেন এই চোখে-

> "আমার কালের কথা মনে করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে কালকে। ধরাশায়ী বিশালাকায় ঘনপল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শব দেহের কথা। শালপাংশু মহাভুজ, লৌহকপাটের মত বুক, প্রশস্ত ললাট, ললাটে সারি সারি চিন্তাকুল বলিরেখা। গভীরদৃষ্টি মানুষটির জীবন প্রতিচ্ছবি মনে পড়ে না। মনে পড়ে কঠিন হিম শীতল দেহ, অর্ধনিমীলিত স্থির শূন্যদৃষ্টি চোখ, নিথর হয়ে পড়ে আছেন, ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন যেন অন্তরের ধ্যানে। এই আমার সে কালের ছবি। তাই সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রণাম করি, তাঁর মহিমার কাছে আমি নতমস্তক।"[২]

তিনি 'কালের লীলা' বর্ণনায় বিশেষ আগ্রহবোধ করেছেন, 'কালান্তরের রূপমহিমা' তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। তিনি কাল থেকে কালান্তরের দিকে পথ চলেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যের আকরভূমি হয়ে উঠেছে দেশ-কাল-পাত্র।

অষ্টাদশ-উনবিংশ-বিংশ-শতাব্দীর পটভূমিকায় তারাশঙ্কর লিখেছেন নানা গল্প-উপন্যাস। তার প্রত্যেকটির মধ্যে ধৃত রয়েছে কাল থেকে কালান্তরজয়ী ব্যক্তি ও সমাজের, পট ও পটবিধৃত পাত্রের রূপ থেকে রূপান্তরের যাত্রার নানা যন্ত্রণা, নানা মোচড়। 'Every age is an age of transition'-প্রত্যেক যুগ একই সঙ্গে উপসংহার ও উপক্রমণিকা-প্রত্যেক যুগের মধ্যে আছে জয়মান ভাবীকালের প্রসবার্তি। ইতিহাসের এই সূত্রকে সাহিত্যে তারাশঙ্করের মতো আর-কেউ ব্যবহার করতে পারেনি। তাই তিনি দেশ-কাল-ব্যক্তি এবং চলিষ্ণু ইতিহাসকে অন্বিত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেশ এবং কাল, টাইম এবং স্পেস সম্বন্ধে তারাশঙ্করের চেতনা তাঁর স্বভূমি এবং সজাগ স্বাভিজ্ঞতার দান। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে কালের অনুসারী না হতে পারলে তিনি কালজয়ী সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারবেন না। তাই তিনি কালকে অনুসরণ করে গেছেন বরাবরই।

তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে বৈপরীত্যের সহাবস্থান খুব সুন্দরভাবে তুলে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর আবির্ভাবের একটু আগে থেকেই মানুষের সুপ্ত জীবনবৃত্তি বা যৌন কামনা বাসনার গল্প লেখা শুরু হয়েছে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রমুখ গল্প লেখকদের হাত ধরে। কিন্তু জান্তব বৃত্তির সঙ্গে মানুষের আত্মিক ক্ষুধা, হিংস্রতার সঙ্গে সারল্য-এই জাতীয় বৈপরীত্যের সহাবস্থান তারাশঙ্করের গল্পে আমরা লক্ষ করি। মানুষের ভিতরকার এই বিপরীত স্বভাবের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারাশঙ্কর সচেতন হয়ে ওঠেন এবং সেই সচেতনতাই গল্পের ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্রকে স্পষ্ট করে। তারাশঙ্করের গল্পে চলিত ভাষা ও সাধু ভাষার সংমিশ্রণে চরিত্ররা যেন আরও বেশি জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। চরিত্রগুলি অধিকাংশই তাদের অঞ্চল ভেদে চলিত ভাষায় কথা বলে কিন্তু স্বয়ং তারাশঙ্করের ভাষা সাধু ভাষা। এক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছেন রাঢ় অঞ্চলকে। মূলত এই অঞ্চলের নিম্নবর্গ মানুষ যেমন তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে ঠিক সমান্তরালে উঠে এসেছে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সেই সমস্ত মানুষদের কথা যারা নিজেদের বংশ গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েও মাথা নত করেছে কালের সেই নির্মম আঘাতের কাছে। যার ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছে নাটকীয়তা। তাই তাঁর বহু গল্পে মানসিক দ্বন্দ্বের বহির্মুখী প্রকাশ স্পষ্ট। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় তার মর্মান্তিক আত্মপীড়নে সাধের তুফান ছুটিয়েছেন কশাঘাতে। ফিরে এসে চাবুক বসিয়েছে জলসাঘরের দরজায়। 'তিনশূন্য' গল্পের বীভৎস ভিখারী কামনার তাড়নায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে লালসা মেটাতে। আবার 'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণী মাঝি বন্যার স্রোতে নিছক অস্তিত্বের তাড়নায় স্ত্রী সুখীর গলা টিপে ধরেছে। এইরকম নাটকীয়তা আমরা অন্যান্য গল্প গুলিতেও লক্ষ করি। এই নাটকীয়তার জন্য তারাশঙ্করের গল্পগুলি আরও চমকপ্রদ হয়েছে।

এবারে দেখা যাক তাঁর গল্পে দ্বন্দ্ব কীভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে, কীভাবে কালের প্রভাবকে তিনি একালের পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, কীভাবে তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে কালের প্রবাহকে ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু ব্যক্তি চরিত্র বললে ভুল হবে, পশু চরিত্রের মাধ্যমেও সেই কালের প্রভাব বা প্রবাহকেও দেখিয়েছেন। যে সমস্ত গল্পে কালের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এসেছে সেই গল্পগুলি নিম্নে আলোচিত হল।

'জলসাঘর' তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এটি রায়বাড়ি অর্থাৎ জমিদার বাড়ির গল্প। অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্রের গল্প এটি। বিশ্বম্ভর রায় এক পড়ন্ত জমিদার। পড়ন্ত জমিদার বাড়ির পরিবেশটুকু অঙ্কনে তারাশঙ্কর অসম্ভব

মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। জমিদারতন্ত্রের ক্রম অপসৃতমানতার কালে সমাজে মানুষের শ্রেণিগত অবস্থানের পুরানো নক্সাই যে ভাঙচুর এবং রদবদল ঘটেছে, সমাজ-সচেতন শিল্প দৃষ্টির অধিকারী তারাশঙ্কর স্বাভাবিকভাবেই তার দিকে ঝুঁকেছেন। নিজে পড়তি জমিদার বংশের সন্তান হওয়ার সুবাদে এই সমাজ পরিবেশের দ্বন্দ্বকে ভেতর থেকে অনুভব করার আরেক সুযোগ ছিল তাঁর। তাঁর কথায়-

> ‘‘সমাজতন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু’চোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।’’[৩]

একালের নতুন ব্যবসাদার ধনী মহিম গাঙ্গুলির সঙ্গে রায় বংশের সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায়ের পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই যেন তারাশঙ্কর সেকাল এবং একালের প্রতীক হিসাবে দুজন প্রতিনিধিকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। শেষে বিশ্বম্ভর রায়ের পরাজয় যেন একালের কাছে সেকালের পরাজয় স্বীকার করাকেই স্বীকৃতি দেয়। অন্যদিকে, ‘সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার’ গল্পে সরকার মশাইদের পাঁচ পুরুষ পূর্বের জমিদারির আজ শোচনীয় অবস্থা। রামেন্দ্রের মামা এই পূর্বপুরুষের জমিদারীকে কিছুতেই হাত ছাড়া হতে দেবেন না বলেই নিজে প্রজাদের কাছে গিয়ে খাজনা আদায় করেন। পুরনো আমলের যে নিয়ম কানুন সেসমস্তকে মেনে পূর্বপুরুষের খাজনা আদায়ের পদ্ধতিকে সামনে রেখে মানুষের সামনে উপস্থিত হলে এতেও মানুষের অপমান ও বিদ্রুপ শুনতে হয় তাকে। তাকে ‘কাগজ বাবু’ বলে সম্বোধন করতেও ভয় পায় না মানুষ। সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে এখন কেউ আর সরকার মশাইকে ভয় পায় না। সবাই সরকার মশাইয়ের উপর কথা বলার মতো সাহস পেয়ে গেছে। আসলে পরিবর্তমানতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষও যেন নতুনকেই গ্রহণ করতে চাইছে। তাই উঠতি জমিদারদের কাছে তারা যেন বিশেষ করে নিজেদেরকে উজার করে দিচ্ছে। তাই যখন সরকার মশাই খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের কাছে রওনা দেন তখন মাঝপথে দেখা হয় মিত্তিরদের জমিদারদের নায়েবের সঙ্গে। যেহেতু মিত্তিরদের খাজনা থেকে উপার্জন সরকার মশাইদের থেকে বেশি। তাই প্রজারাও তোয়াজ করে চলে মিত্তিরদের। তাই সরকার মশাইকে আমল না দিয়ে মিত্তির বাড়ির কাছারিতে সবাই গিয়ে জড়ো হয়। কারণ হিসাবে নন্দলাল জানায়-

> “বসেন গো কত্তা। বাবুদের ডাকে সবাই আসবে-আপনার কাজও হয়ে যাবে। আর তো মোড়লদের ঘরে কেউ আসবে না। ডাকতে গেলে বলবে-আজকে যেতে পারছি না-হয়তো এবারে দিতেই লারব।”[৪]

সুতরাং বোঝায় যাচ্ছে সাধারণ মানুষ তাদেরকে আর মান্যগণ্য করে চলছে না। সরকার মশাই যতরকমভাবে গোষ্ঠ পালকে ভয় দেখাতে যাক না কেন সে কিন্তু আর ভয় পায় না। এমনকি তার নামে নালিশ করা হবে বললেও সে কিন্তু ভয় পায়নি। এমনই ঔদ্ধত্য যে সরকার মশাইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে কাছারি ছেড়ে চলে যায়। ভরা কাছারিতে সেদিন সরকার মশাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে সেসছিলেন। তার ভাগ্নে রামেন্দ্রর বাড়ি ফেরা কে কেন্দ্র করেও তৈরি হয় একটা দেখিয়ে দেওয়ার মানসিকতা। তাই ভাগ্নেকে আনতে গিয়ে তার সঙ্গে অল্প জিনিস দেখে সরকার মশাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে আর বাকি জিনিস কোথায়? রামেন্দ্র জানায় সে এই গুটিকয়েক জিনিসই এনেছে। কিন্তু তার মামা নিরাস হয়ে উল্টো কথাই তাকে জানায়-

> “আনতে হয় রে-জিনিস পত্র কিছু বেশিই আনতে হয়। আমাদের হল পুরোনো বনেদী ঘর-পাঁচজন দেখে-দুটো আশাও করে।”[৫]

আর এই বনেদী বাড়ির মানসম্মান, আভিজাত্য বজায় রাখতে গিয়ে অস্বাভাবিক রকমভাবে মানুষের কাছে হেয় হতে হয়। আর সেটা সহ্য করতে পারে না রামেন্দ্র। তাই একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে বলে বাড়িতে ফিরে এসে যখন মামার সামনে দাঁড়ায় তখন মামা তাকে জানায়-

> “তুই বড় হয়েছিস, আমারও ধর বুড়ো বয়স-খরচ আমি বেশি করবো না-আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দে।”[৬]

শেষ পর্যন্ত সরকার মশাই তার জমিদারী, আভিজাত্য ও বংশ গৌরব ত্যাগ করে। যেন এই নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সে অপাংতেয় হয়ে উঠেছে। তাই মানুষ যেন তাকে আর গ্রহণ করতে পারছে না। আর যেটুকু গৌরব অবশিষ্ট আছে সেটা নিয়ে কাশীতে চলে যেতে চেয়েছে।

'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পে মানভূমের ফায়ার ব্রিক্স কারখানার খাজাঞ্চিবাবুর বিদায় দৃশ্যটি একেবারেই অনাড়ম্বর বলেই তা আরও বেশি চিত্তস্পর্শী হয়েছে। কালের পরিবর্তন হয়, পুরনো পদ্ধতির বদলে আসে নতুন পদ্ধতি। কারখানাতেও নতুন জিনিস আনা হয়েছে, নতুন দিনের নতুন নিয়মের কাছে তাই সে বাতিল, সে অযোগ্য, তাই তাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু চলে যেতে বলাটা যতটা সহজ, চলে যাওয়া ততটা সহজ নয়; কঠিন, অনেক মর্মবিদারী। এখানে তারাশঙ্কর যেন দেখালেন যতই আমরা কালের বিরুদ্ধে দাঁড়াই না কেন পরাজয় নিশ্চিত। খাজাঞ্চিবাবু তারই বার্তাবাহক।

আরও একটি গল্প 'পিতা-পুত্র'-তেও তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে দুটি প্রজন্মের মানুষের মানসিক চিন্তাভাবনা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ করবার বিষয় তারাশঙ্কর এখানে সরাসরি কালের প্রসঙ্গ আনলেন না। বদলে ভিন্ন দুটি মানুষকে তুলে ধরলেন শিবশেখর আর শশীশেখরকে। যেখানে পুত্র পিতার পরামর্শ মানতে চায় না আর পিতাও তার সিদ্ধান্তে অনড়। গল্পের শশীশেখর পিতা শিবশেখর সম্পর্কে বলে–

> "পরাধীনতার জন্য এমন মনোভাব হয়েছে যে, প্রাচীন পণ্ডিত ভুল বললেও তাঁর প্রতিবাদ করাটা পর্যন্ত অন্যায়ের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছে।"[৭]

–এর থেকে প্রমাণ হয় যে পিতা-পুত্রের মধ্যে একপ্রকার মানসিক দ্বন্দ্ব চলছে। এই রকমই আর একটি গল্প 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া' সেখানেও তারাশঙ্কর সরাসরি কালের প্রসঙ্গ আনেনি। প্রতীক হিসাবে দেখিয়েছেন দুটি জীবকে, একদিকে গবিন সিংয়ের ঘোড়া প্রবীণ আর অন্য দিকে গবিন এর ছেলে নবীন। এদের নাম দেখেই আমরা কিছুটা দ্বন্দ্বের আভাস পাই। নবীনের শ্বশুরবাড়িতে ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে যখন প্রবীণকে পুণ্যছত্রীদের ঘোড়াটা সজোরে পিছনের পা দিয়ে লাথি মারলো তখন–

> "প্রবীণের হুংকারের আধখানা মুখেই রয়ে গেল–সে চিৎ হয়ে উলটে পড়ে গেল।"[৮]

এখানে প্রবীণের চিৎ হয়ে পড়ে যাওয়াটাকে লেখক যেন দেখালেন নবীন কালের কাছে প্রবীণ এই ভাবেই হেরে যায়। কালের লীলা বড়ো নিষ্ঠুর তাই তাকে স্বীকার করে নেওয়াটাও কষ্টের।

তারাশঙ্করের এমনি আর একটি গল্প হল 'ময়দানব'। ময়দানব গল্পের প্রধান চরিত্র ফণি মিস্ত্রী। সে ফায়ার ব্রিক্স কারখানায় খুবই অল্প বয়স থেকে কাজ করছে। তার সঙ্গে কারখানার এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কারখানা হয়ে উঠেছে তার একান্ত নিজের। কিন্তু হটাৎ করে তার এই স্বাভাবিক জীবনে নতুন মোড় আসে। তাকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। সে ভাবে, তাকে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হবে কিন্তু সেরকম কিছু হয় না। তারাশঙ্কর এখানে অসাধারণ দক্ষতার সাথে গল্পের অন্য আরেকটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে-'ফনি মিস্ত্রী–কালও ছিলো'। অর্থাৎ কালও ফনি মিস্ত্রী ছিল কিন্তু আজ নেই। কাল যেন তাকে আর স্বীকার করছে না। এখানে যেন কোথাও ফনিকে কাল অস্বীকার করছে, অস্বীকার করছে নতুন কারখানার ম্যানেজের, নতুন কারখানার নতুন শেড ও কারখানার বৈদ্যুতিক আলো। তাই লেখক আমাদেরকে বার বার করে বলেছেন-'কাল ছিল', অর্থাৎ আজ নেই। কালের চরিত্র যেহেতু চলিষ্ণু তাই ফনির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। আরও স্পষ্ট করে বললে হয় যে তার আর কোন অস্তিত্বই নেই। আবার গল্পের সিংগী নামের আর এক চরিত্রের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তাদের নতুনের কাছে পুরোনো ফনির দাম নেই-

> "সভার মধ্যে সেই ছোঁড়া দুলু সিংগী, যাকে সে হাতে করে মানুষ করেছে—সেই তাকে 'বুড়ো', 'বাতিল', 'সেকেলে' লোক বলে গাল দিল।"[৯]

আমরা আগেও দেখেছি পরিবর্তমান কাল প্রবাহে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র রচনায় সুদক্ষ তারাশঙ্কর চলমান কালেরই সহযাত্রী কথাকোবিদ। ছেচল্লিশ এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ছিন্নভিন্ন মহানগরীর একটি প্রতীকী ছবি তিনি আঁকলেন 'বিস্ফোরণ' গল্পের মধ্যে দিয়ে। রামতারন এই গল্পের মূল চরিত্র। বিগত কালের প্রতিনিধি হিসাবে লেখক তাকে তুলে ধরেছেন আমদের সামনে এবং শেষে এর পরিণতি আমরা দেখতে পাই।

'পৌষলক্ষ্মী' নামে বিখ্যাত গল্পটিতে চাষি মুকুন্দ পালের সঙ্গে জোয়ান চাষি শ্রীকৃষ্ণ পালের প্রতিদ্বন্দ্বীতার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পটির মধ্যে মুকুন্দলাল ও শ্রীকৃষ্ণকে যেন দুই কালের প্রতিনিধি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পে মুকুন্দলালের যৌবনের কালের কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে মুকুন্দলাল অক্ষম

তাই তিনি হতাশাগ্রস্থ। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ পাল এ যুগের জোয়ান চাষি, শ্রীকৃষ্ণ পাল নানারকম রঙ্গ, ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েনি মুকুন্দলালকে। কারন, মুকুন্দলাল আর আগের মত চাষের জমিতে খাটতে পারে না তার বয়স বেড়েছে, সে এখন পুরনো হয়ে গেছে। তাই বার বার সে শ্রীকৃষ্ণের কাছে অপদস্ত হয়েছে। এ ভাবেই এই 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পে তারাশঙ্কর দুটি চরিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন কালের প্রতীক হিসাবে।

রামায়ন-মহাভারতের প্রসঙ্গ যে একালের ছোটগল্প রচনায় সার্থক রূপকল্প হয়ে উঠতে পারে তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'জটায়ু' গল্পটি। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী কালের ঘটনা। ভারত বিভাজনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ লেগেই আছে। সেই কালের প্রেক্ষাপটে তিনি দুটি চরিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। একটি হল কালাগোঁসাই আর জটা পাগলা। কালাগোঁসাই কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে রূপধারণ করে নিজের জীবিকানির্বাহ করে। তার যেটা চাই সেটা না পেলে সে সাধারন মানুষের উপর অত্যাচার করে। আর অন্য দিকে জটা পাগলা। সে জন্ম পাগল। গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই যে কালাগোঁসাই আর জটা পাগলার লাশ পাশাপাশি নিথর হয়ে পড়ে আছে এই ভাবে গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে।

এরকমই আরও একটি গল্প হল 'জন্মান্তর'। জন্মান্তর গল্পের পূর্বনাম ছিল 'হৌমবতীর প্রত্যাবর্তন'। হৌমবতী বলরাম চাটুয্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। নিঃসন্তান বালবিধবা এই মেয়েটি যেন আগুনের মতই সারাজীবন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়েছে। স্বামী ছিলেন প্রতাপান্বিত গ্রাম শাসক, জমিদারীর অহংকার কম ছিল না। স্বামীর স্বভাব ও সম্পত্তিতে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে হৌমবতী কারো ভাষায় 'খণ্ডরানী', কেও বলে 'রানীদুর্গা', কেও 'ঝাঁসিররানী'। কিন্তু কালের পরিবর্তন চলছে অব্যাহত গতিতে। ১৯৬১ সালের জমিদারী বিলোপ আইন পাশ হয়ে গেল। এই লক্ষ্মীছাড়া দেশ ছেড়ে হৌমবতী চলে যাবেন বৃন্দাবন। সংসার বৈরাগ্যের আরেকটি কারণ ছিল, সতিনের ছেলে নিলু। উৎশৃঙ্খল নিলু আচার ব্যবহারে কালাপাহাড়। সে হৌমবতীর সহ্য সীমাকে শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিষয় আশয় সব নিলুকে বুঝিয়ে দিয়ে যখন তিনি আসক্তিমুক্ত হবেন এমন সময় তার চোখে পড়ল চার বছরের একটি কচি শিশু। নিলু-রই ছেলে যেন তারই শিশুমূর্তি। ওই শিশু মুখ খানিকে দেখে আজীবন সন্তান বুভুক্ষ বিধবার জন্মান্তর হল।

পরিশেষে বলায় যায়, মূলত অভিজ্ঞতাই তারাশঙ্করের লেখক চরিত্র তৈরী করেছিল। বিচিত্র, ব্যাপক, অথচ খুবই বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা। সামন্তযুগ ও শিল্পায়নের সন্ধিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধওোর বাংলাদেশের পটভূমিতে দাড়িয়ে তারাশঙ্কর জীবনের যে দ্বান্দ্বিক চেহারাটিকে লক্ষ করেছেন, মনে হয় তারই টানে তার গল্পে সময়-বদলের প্রকাশ কৌশলটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসে পড়েছে। অতীত ও বর্তমানের বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েনে তার বহু গল্প এক বিদীর্ণ মানসিক সত্তাকে তুলে ধরেছেন। তারাশঙ্কর জানতেন দুয়ারে বাঁধা হাতির দিন গেছে, মোটর গাড়ির গতির কাছে হার মানতে বাধ্য ওই কালের গজেন্দ্রগমন। সময় ও সমাজ সচেতন শিল্পী সেই পুরনো কালের জন্য হতাশ্বাস ফেললেও এই নতুন কালের ছবি আঁকায় ক্লান্ত। আসলে বংশানুক্রম এবং দেশ-কালে সংস্থিত থেকেও তারাশঙ্কর সার্বভৌম মানবমুক্তির মহৎশিল্পী-কূলধর্মে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী কিন্তু শীলধর্মে মানবশিল্পী। সহজ-সাধনের কবি চণ্ডীদাস একদিন যে প্রসঙ্গে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'-এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গকে অক্ষুন্ন রেখে তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্পর্কে বলা যায়,-'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

তথ্যসূত্র:

১। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার ও রায়, জ্যোতিপ্রসাদ (সম্পাদিত), ছোটগল্প : বিকাশ, পরিণতি ও উপলব্ধি, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৮

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৫৬

৩। দাশ, উদয়চাঁদ (সম্পাদিত), ছোটোগল্পের বর্ণালি: কথা থেকে শৈলী, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০৭, আশ্বিন, ১৪১৪, পৃ. ৯৮

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হারানো সুর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬২, পৃ. ৮৭

৫। তদেব, পৃ. ৮৫

৬। তদেব, পৃ. ৯২
৭। ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ প্রকাশনী, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২২৯
৮। তদেব, পৃ. ৬২
৯। তদেব, পৃ. ৪২১